# নির্বাচিত হাংরি গল্প

# নির্বাচিত হাংরি গল্প

সম্পাদনা

সৌম্য সরকার  মোস্তাফিজ কারিগর

নির্বাচিত হাংরি গল্প
সম্পাদনা: সৌম্য সরকার  মোস্তাফিজ কারিগর

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ডা. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৫০০ টাকা

---

*Nirbachito Hungry Golpa* [Selected Hungry Short Stories] edited by Soumya Sarker & Mostafiz Karigar Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Basement 253-254 Dr Kudrat-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205
First Edition: February 2021
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736 (bkash) +88-01641863570
Price: 500 Taka RS: 500 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

**ISBN:** 978-984-94949-1-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

# ভূমিকা

এক.

এক বছর আগে *নির্বাচিত হাংরি কবিতার* ভূমিকায় আমরা যা লিখেছিলাম তুলে দিতে চাই এখানে:

ক.

'মাতৃভাষা' শব্দটা নির্দোষ নয়। 'পতাকা' যে ধারণার কাছে নিয়ে যায় তা আপনাকে-আমাকে-তাকে হিংসাত্মক করে ফেলে। শোকের রং কালো হতে পারে না। কালো পতাকা, কালো রাত, ব্ল্যাক লিস্ট, ব্ল্যাক মেইল, কালো আইন, কালো বাজার, কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, কালো জাদু এসব রেইসিস্ট শব্দ। এর মধ্যে আছে ক্ষমতা আর শোষণ। পৃথিবীর অধিকাংশ গালি পুরুষের, এমনকি অধিকাংশ শব্দই পুরুষের। সভাপতিকে সভাপ্রধান বললে তিনি মানতে পারেন না। স্বামী একটি অগ্রহণযোগ্য শব্দ। কুত্তার বাচ্চা, শুয়রের বাচ্চা বললে কুত্তা ও শুয়রকে অপমান করা হয়। ধর্ষণ কোনো 'পাশবিক' কর্ম নয়—একান্তই 'মানবিক'—কোনো পশু ধর্ষণ করে না অন্য পশুকে, প্রপার কোর্টশিপ করে তারা যৌনতা করে। 'মানবিক' মানে কেবলই প্রেমমায়ামহব্বতদয়া কেন বুঝি আমরা মানুষেরা? পাখির কাছ থেকে আকাশে ওড়ার কৌশল শিখেছি বলে প্রচার, কিন্তু যৌনবিজ্ঞানটা শিখিনি বলে মনে হয়। 'বাঘের বাচ্চা' বললে গর্বে বুক ফোলে, 'গাধার বাচ্চা' বললে অপমানে পোড়ে গা। রাষ্ট্রপতি নারীই হোন, পুরুষই বা অন্য সেক্সের কেউ তিনি রাষ্ট্র*পতি*ই থাকেন। 'সহধর্মিনী' আমরা কত সহজে ব্যবহার করি—না ভেবে যে এর কোনো পুং-বাচক শব্দ তো নেই-ই, ভিন্ন ধর্মীদের মধ্যে বা নাস্তিক মানুষদেরও বিয়ে-টিয়ে হয়ে থাকে। 'দায়িত্ব' শব্দ আমাদের দেয় কিছু কৃত্রিম প্রণোদনা। অথচ আমরা বলি—দায়িত্ব দায়িত্ব দায়িত্ব...

প্রতিষ্ঠান আমাদের এভাবে বলতে শেখায় তাই বলি। শব্দের মধ্যে শোষণ-চক্র যে থাকে তা লক্ষ না করেই বলি। কবিরা কাব্য করেন ক্ষমতাবানদের ভাষায়, গদ্যকাররা গদ্য করেন ক্ষমতাবানদের ভাষায়। আমাদের বিদ্যালয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের পরিবার, আমাদের মিডিয়া আমাদের এভাবেই বলতে বলে, চলতে বলে। 'নৈতিকতা' খুব দুর্বলভাবে সংজ্ঞায়িত কি নয়? প্রবৃত্তি কি পিষ্ট নয়? প্রকাশ কি বাধাগ্রস্ত নয়? যা কিছু প্রচলিত তাতে আমরা অভ্যস্ত, যা কিছু প্রসিদ্ধ তার প্রতি আমরা বিশ্বস্ত।

সবসময় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকি আমরা, গডোর প্রতীক্ষায় থাকি আমরা। আর প্রতারণা করি নিজের সঙ্গে—নগ্ন নিজের সঙ্গে। প্রচারণা করি আত্মস্বার্থে। ব্যাপক আমাদের লোভ। চারদিক থেকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ এবং আমরা অভ্যস্ত হই নিয়ন্ত্রণে—এমনকি মোহিত হই...

ভাবছিলাম হাংরি জেনারেশনের লেখা ও লেখকদের নিয়ে। বাংলা ভাষার সবচেয়ে সংগঠিত সাহিত্য আন্দোলন—ভেঙেছে প্রচল। নির্ভুল তারাও নন—কিছু ক্ষেত্রে তারা 'পুরুষ লেখা' লিখেছেন, যৌনতার প্রশ্নে নারীকে প্রধান উপজীব্য করেছেন ভাষায়। নির্ভুল, শুদ্ধ লেখা তারা লিখতেও চাননি। ভয়হীন, দ্বিধাবিহীন, নির্মেদ এবং ভান-ছাড়া যে সত্য ও আত্মপ্রকাশ তাদের লেখায় তা আমাদের শিহরিত করে, সাহসী করে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ। সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ঈশ্বর। "ঈশ্বর হলো ক্ষমতার চূড়ান্ত চেহারা। তাই ঈশ্বর নামক কেন্দ্রটির বিলুপ্তি চেয়েছি আমরা।"—লিখছেন শৈলেশ্বর ঘোষ। এমনকি ভালোবাসা। "ভালোবাসার মধ্যে হিংসা লুকিয়ে আছে, এই বোধ ক্রমেই স্ফুট হচ্ছে। মানুষ নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য 'ভালোবাসা' শব্দটা আবিষ্কার করেছে বলেই মনে হয় আজ। 'আমি মানুষকে ভালোবাসি'—এটা একটা অর্থ-শূন্য ছেঁদো কথা মাত্র।" অর্থাৎ আমরা সবসময় যেন কোনো এক কেন্দ্র খুঁজে বেড়াই আর ক্ষমতা সেই কেন্দ্র খোঁজার দালালিটা করে। "বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থান" সত্যকে শিল্প হতে দেয় না বা শিল্পকে সত্য। আমাদের 'শিল্প' হয়ে উঠতে চায় বিজ্ঞান-অমনস্ক। আর হাংরিরা তাই শিল্পকেই অস্বীকার করেন: মানুষের হাতে বিকৃত হওয়া পৃথিবীর "বিকৃত মুখশ্রীকে সুশ্রী দেখাবার ছলনায় তৈরি হলো গল্প কবিতা ছবি—যাকে বলা হলো 'শিল্প'—এই শিল্প জিনিসটাকে আমরা বলেছি ভূষিমাল—এই তথাকথিত শিল্পকে ধ্বংস করেছে হাংরিরা।" লিখেছেন তারা এক নতুন ভাষায়—নুয়ে পড়া, নেতিয়ে পড়া, এলিয়ে পড়া, পিছলে পড়া, সামলে নেয়া কোনো ভাষায় নয় বরং এক হামলে পড়া, কামড়ে দেয়া প্রবল, তীক্ষ্ণ ভাষায়। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাসিকা, অনুবাদ—সবগুলো ফর্মেই—ফর্ম ভেঙে

খ.

ব্যক্তির কদর্য গর্তের ভেতরে, ব্যক্তিই যেখানে প্রতিষ্ঠান নামক পাবলিক টয়লেট—সেখানে নেমে গিয়ে গু-গোবর ছেনে-চিবিয়ে, পুনরায় ব্যক্তির মুখের ওপর বমন করে দিয়ে শিল্প নয়—পুরোহিততন্ত্রের বিষ্ঠা লেহনে পুষ্ট সমাজ-কাঠামোকে পুড়িয়ে দেয়া অদম্য স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গদ্যপদ্যে একদল কবি-লেখক। শুরুতে তার প্রকাশরূপ অনেকটাই ইশতেহারে, স্লোগানধর্মিতায়; তারা চাঁদের ওপিঠে দাঁড়িয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন পৌরাণিক দৃশ্যব্যাখ্যার কাঠামো—অভিজ্ঞতাই হয়ে উঠেছিল তাদের ধর্ম। ক্ষুধার বিশাল মুখব্যাদানের মধ্যে ঢুকে পড়ে স্পষ্টতই তারা আবিষ্কার করেছিলেন খাদ্য আন্দোলনের সময় বিক্ষুব্ধ স্কুলপড়ুয়ারা যে অফিসগামী বাবুদের টিফিন ক্যারিয়ার কেড়ে নিচ্ছিল—ক্ষুধার কেবল প্রকার এই নয়;

ক্ষুধার স্বরূপের থেকে তারা চুষে নিতে চেয়েছিলেন রসের সমস্ত উপাদান। প্রতিষ্ঠানের বেঁধে দেয়া ভাষা-ছকে নয়, ভাষার শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া এক নতুন ও স্বতন্ত্র লেখনীদণ্ড নিয়ে শব্দের সাজানো সমাজকে অস্বীকার করে শব্দের আদিকে নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন রাষ্ট্রের ঠিক নাকের ওপর।

ষাটের দশক—সমস্ত দুনিয়াজুড়ে তরুণ সমাজের বিদ্রোহ—সঙ্গে হাংরি আন্দোলনের লেখক-কবিদের দু-একজন বাদে প্রায় সবার গায়েই লেগেছিল তখনও সদ্য দেশভাগের দগদগে ঘা। নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সমস্ত গরল তারা উগড়ে দিতে থাকলেন বেনিয়াদের টি-টেবিলে। উত্তরীয়ের ভারবহনকারী শিল্পী-সাহিত্যিক হওয়ার কদর্যতাকে ধমক দিয়ে তারা শিল্প-সাহিত্যকে যাপন করতে চেয়েছিলেন। হাংরি আন্দোলন হয়ে উঠেছিল সেইসব যাপনের নিখাদ ডকুমেন্টেশন।

রাষ্ট্র ভয় পেল, প্রতিষ্ঠানের নামাবলি গায়ে দেয়া কবিতা-গল্প লেখকরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলো তাদের নামে—কিছুকাল হাজতবাস হলো কারও কারও। দু-একজনের চাকরি গেল, কারও সাময়িক চাকরিচ্যুতি। আর হাংরি আন্দোলনের এই সমস্ত লেখনী হয়ে রইল আধুনিক সমাজব্যাখার অভিনব ভাষ্য—যা মানুষের ভেতরের 'আমি'কে ভেঙে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। বস্তুত 'আমি'র যে উল্লম্ফন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার তাঁইস করে, সেইসবের বিরুদ্ধেই ছিল হাংরিদের সৎ বীক্ষণ।

দুবাংলার বইবাজারে হাংরি আন্দোলনের কয়েকটি সংকলন এখন লভ্য। হাংরি আন্দোলনবিষয়ক নানা গ্রন্থও। ভাষা এক হওয়ার ট্র্যাজেডিকে সঙ্গে নিয়ে দুটো দেশের বাংলা ভাষার পাঠকের দিন গুজরান। পশ্চিমবঙ্গে হাংরিচর্চা যেভাবে বিস্তার পেয়েছে, বাংলাদেশে সেই তুলনায় যারপরনাই কম। তাই, তারকাঁটার শাসন উপেক্ষা করে, আক্ষরিক অর্থেই কারও অনুমোদনের তোয়াক্কা না করে কেবলমাত্র হাংরি-সাহিত্য যতটা নয়, তারও চেয়ে বেশি হাংরি সাহিত্যিকদের জীবনবীক্ষণ বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যচর্চাকারীদের কাছে উন্মোচিত করার প্রয়াস আমাদের এই সংকলন। মূলত পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত নানা সংকলনকে সহায়ক মেনে আমরা হাংরি সাহিত্যিকদের যাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কবিদের কবিতাকেই সংকলনে সংযুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। এই সংকলন—বাজারে ভাসমান হাংরি সংক্রান্ত সমস্ত তর্ককে আলতো সরিয়ে রেখে—কেবল হাংরি সাহিত্যকে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত রাখার আরেকটি তৎপরতা। বানান সম্পর্কে একটি কথা: কিছু ক্ষেত্রে সংগত কারণে কবিদের নিজস্ব বানান অক্ষত রাখা হয়েছে।

আমরা যারা পাঠক তারা যেন প্রস্তুত থাকি, আমরা যারা লিখি তারা যেন নিরীক্ষা করি। আমাদের সাহিত্য যেন শুধু না হয় মানুষকেন্দ্রিক এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক।

## দুই.

তারপর দুই হাজার বিশ আমাদের অনেক কিছু দেখিয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু। মানুষের বানানো অর্থনীতির আপাত

স্থবিরতা। ধনীদের আরও বিত্তশালী হওয়া। গরিবদের হওয়া গরিবতর। প্রকৃতি কিছুটা স্বস্তি পেলেও পৃথিবীর আরও উষ্ণ হয়ে ওঠা থামেনি। সবচেয়ে বেশি সাইক্লোন হওয়া বছরগুলোর একটি এই বিশ। পৃথিবীজুড়ে ভয়াবহ সব দাবানল। নারীর প্রতি পুরুষের সহিংসতা বেড়েছে বই কমেনি। বর্ণবাদ এত ভয়াবহ আকার নিয়েছে যে এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদও দেখেছি আমরা। মৌলবাদ থামেনি। মিলিটারি সহিংসতা চলেছে। আদিবাসীরা ভূমি হারিয়েছে। জেনোফোবিয়া, হোমোফোবিয়া লাগামহীন। সারভেইলেন্স তার পরিধি বাড়াচ্ছে। মিডিয়া ও অনলাইন সন্ত্রাস অবাধ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো মানুষের তথ্য চুরি করে দিয়ে দিচ্ছে মাল্টিন্যাশনাল ব্যবসাদারদের কাছে...

সাহিত্য তবু হয়ে চলেছে। আমরা চাই এত কিছুর বিপরীতে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিকদের আরও দৃঢ় অবস্থান।

তিন.

"ধর্ষণকালে নারীকে ভুলে গিয়ে শিল্পে ফিরে এসেছি কতদিন" বা
"আমাকে ধর্ষণ ও মরে যাওয়া শিখে নিতে হয়নি"
এমন পঙ্‌ক্তি যার কবিতায় আছে তিনি একজন কবি হিসেবে পরিগণিত! লজ্জা বঙ্গসাহিত্যের! এই লাইন যে কবিতার ('প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'), তার পার্সোনা ধর্ষক নয় শুধু, সিরিয়াল রেইপিস্ট ('কতদিন!')। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন আলোচনায় ওই লেখকের কী 'ঐতিহাসিক' ভূমিকা জানা কি জরুরি আমাদের? তার লেখা নির্বাচন করে কোন ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতাম আমরা আমাদের *নির্বাচিত হাংরি কবিতা* ও *নির্বাচিত হাংরি গল্প*তে জানা নেই। যেহেতু মানুষ জিজ্ঞেস করছে তাই কৈফিয়ত দিচ্ছি আরকি।

যৌন বোধের বাধাহীন প্রকাশ, অবদমন থেকে মুক্তি চাওয়া শব্দে-শব্দে এবং ইমেইজে আর ধর্ষণের ঘোষণা শিল্পের নামে এক জিনিস নয়—যারা তাকে লেখক মনে করে বা এই কবিতা পড়ে এবং পড়ার যোগ্য মনে করে তাদের আমরা করুণা করি! যারা প্রতিষ্ঠানবিরোধিতাকে আক্ষরিক অর্থে নেয়, পুরুষতান্ত্রিকতা যে কৃষি সভ্যতা-পরবর্তী মনুষ্য-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান সেটা না-বোঝে কেন তারা? না-বোঝার ভান করে বোধকরি।

প্রশ্ন উঠতে পারে একটা লাইন দিয়ে একটা লেখকের সমগ্র লেখক-জীবন পর্যালোচনা করা কি শ্রেয়? বহু পঙ্‌ক্তি আছে ওই লেখকের যা 'সেক্সিস্ট'। পৃথিবীর অধিকাংশ 'পুরুষ লেখকরা' পুরুষই থেকে যান লেখক না হয়ে শেষ পর্যন্ত। বহু লেখক থেকে যান রেইসিস্ট বা রিলিজিয়াস বিগটস বা পরিবেশ-অসচেতন বা গণহত্যার সমর্থনকারী। আমরা তাদের ইতিহাসের কোন স্থানে ঠাঁই

দেবো সেটা ভাবতে হবে আমাদেরই। উল্লেখ্য ওই কবিতা, দুর্ভাগ্যক্রমে, বেশ বিখ্যাত (শব্দটা লিখতে গা শিউরে উঠল) কিন্তু ওই লেখক সে কবিতাকে 'অস্বীকার' কি করেছেন? সমালোচকরা কি করেছেন তার যথার্থ পর্যালোচনা? তারা 'ঐতিহাসিকতা' প্রসব ও লালনে ব্যস্ত!

ঐতিহাসিক দায় সারতে বিপদও ঢের এখানে। মলয় রায়চৌধুরী হাংরির যে ন্যারেটিভ পাতিয়েছেন তাতে তিনি রাজাধিরাজ! শৈলেশ্বর, বাসুদেব, সুভাষ, সুবো, প্রদীপ—এই পাঁচজন ছাড়াও বহু শিক্ষক, কবি, শিল্পী, চলচ্চিত্রকার তার কাছে পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়া "লাথড়া খাওয়া, হাফলেড়ো স্কুল মাস্টারগুলো"। জেনোফোব মলয়ের আরও নোংরা কথা: "ভালগার উদ্বাস্তুবাদীদের এজেন্ডা সম্পর্কে আমি এমনিতেই সন্দিহান। আমি সিরিয়াসলি বিশ্বাস করি পশ্চিমবাংলাকে এবং তার জনসমাজকে এরাই ধ্বংস করে ফেলেছে।" উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় ক্ষত যে দেশভাগ তার প্রতি চূড়ান্ত অসম্মান মৌলবাদী মলয়ের। তাই ছুড়ে ফেলে দিই তার তথাকথিত লেখালেখি।

চার.

দায়িত্বের কথা উঠল। এ বিষয়ে একটু জল ঘোলা করি। আমাদের প্রশ্ন: বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব কী? গাল-ভরা শব্দে উত্তর আসে চতুর্দিক থেকে—'জ্ঞান সৃষ্টি করা'! শুনতে বেশ লাগে। আমরা খোঁজ নিয়েছি । বাংলাদেশের এতগুলো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এতগুলো বাংলা বিভাগের মধ্যে দুটিতে মাত্র 'সাহিত্য-আন্দোলন' নামক কোর্সের অংশে 'টীকা' হিসেবে আছে 'হাংরি'—পাঁচ মার্কের টীকায় বাংলাভাষার প্রচণ্ডতম একটি আন্দোলন বুঝিয়ে দাও। কোনো হাংরি লেখকের টেক্সট পাঠ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গে বিশের অধিক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটির বাংলা বিভাগে বাছাইকৃত দশটি সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যে অলটারনেট সেমিস্টারে যে কোনো পাঁচটি পড়ানো হয়। দশটি হচ্ছে হাংরি, শ্রুতি, স্পুটনিক, ছোটোগল্পের নতুন রীতি, ছাঁচ-ভাঙা, বীট, শাস্ত্রবিরোধী, নিম, দলিত সাহিত্য আন্দোলন, উত্তর আধুনিকতা। একজন শিক্ষক প্রতিটি আন্দোলন বিষয়ে পাঁচটির মতো ক্লাস পেয়ে থাকেন এবং তার স্বাধীনতা আছে নির্দিষ্ট আন্দোলনের কিছু টেক্সট বেছে নিয়ে পড়ানোর।

খুব দায়িত্ব পালন হলো বুঝি! এখনও ত্রিশ-চল্লিশ দশকের বাংলা সাহিত্য পর্যন্ত আটকে আছে বেশিরভাগ বিভাগ। আর থিয়োরি ধরে সাহিত্য আলোচনা? অনেক পিছিয়ে বলা বাহুল্য। কিন্তু এতে কোনো বিস্ময় নেই যেন, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ও একটি ক্ষমতা-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। ক্ষমতার গতি অনুযায়ী সে চলে, কথা বলে। সেই বলয়ের বাইরে যেতে হলে যে শক্তি দরকার সে শক্তি সে অর্জন করেনি। বা অর্জন করতে দেয়া হয়নি।

পাঁচ

আমরা কোনো ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে ব্রত নিইনি। আমরা আমাদের পাঠ ও পর্যালোচনা মোতাবেক একটা নির্বাচনে হাত দিয়েছি। তার সাথে সকলে একমত হবেন এমনটা অবশ্য ধরি না। তবে হ্যাঁ, সৎ পঠন সৎ লেখক-প্রকাশক তৈরি করে দিতে পারে আবার সৎ লেখক-প্রকাশক সৎ পাঠক উৎপাদন করতে পারে। খেলাটা কয়েক পক্ষীয়। খেলাটা চর্চার। আমরা সেই প্রস্তাবিত চর্চায় শুধু একটা আঁচড় রাখতে চাই।

ফেব্রুয়ারি
২০২১

# সূচিপত্র

**বাসুদেব দাশগুপ্ত**

রন্ধনশালা ১৩
রতনপুর ২১
বমনরহস্য ৩৩
রিপুতাড়িত ৪২
আনন্দবাজার, গোয়েন্দা আর্তনাদ—রিপরিপ ৫৬
শেষপ্রহরের অভিযান ৬৭
মৃত্যুগুহা থেকে প্রথম কিস্তি ৮৮
মৌন নগরীর ইতিকথা/২ ৯২

**সুভাষ ঘোষ**

হাঁসেদের প্রতি ১০২
ব্যানড ডায়েরির পাতা ১০৫
রেড রোড ১১৩
২৯ ধারা ও আমার রক্তের পরিণতি ১১৫
যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট ১২৩
থ্রু গাড়ির টিকিট ১৫২
টি-বি ভি-ডি ১৫৮
দ্য এ্যামবুশ ১৬৫

**প্রদীপ চৌধুরী**

হাজত ১৭৪

**অরুণেশ ঘোষ**

সন্তদের রাত ১৭৯
খেড় বাড়ির মাঠ ২১৭
থাবা ২২৬

**অবনী ধর**

আমার দুঃখী মা ২৩০
কলিকাতা ভ্রমণ ২৪০
ওয়ান ব্রেড ওয়ান সট ২৫৫
ভাতের জন্য শ্বশুরবাড়ি ২৫৯

**ফালগুনী রায়**

কাঠের ফুল ২৬৪
অহং ২৭৭

**কনক ঘোষ**

যারা দলিত নারী, দলিত পুরুষের পাশে ২৭৯

**সুভাষ কুণ্ডু**

মশামাছি ২৮৫
শ্বাসকষ্ট ২৮৯

**আপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়**

আয়োজিত কার্যক্রম ২৯২
শুকিয়ে যান কেন ২৯৯

**দীপকজ্যোতি বড়ুয়া**

দৃশ্য পরিক্রমা ৩০৭

**বিজন রায়**

একটি হত্যার প্রাক্কালে ৩১২

**সমীরণ ঘোষ**

নিত্যগোপাল ও কামানের গর্জন ৩১৭

বাসুদেব দাশগুপ্ত

# রন্ধনশালা

বনের ধারে ভেড়ার বাচ্চাটাকে একা একা অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে তখুনি আমি সেটাকে খপ করে ধরে ফেললুম। ভেড়ার বাচ্চাটা ওর ধূসর দুটো চোখ তুলে আমার দিকে করুণভাবে তাকাল। আমি বাঁ হাতে ওর পশমি নরমগরম শরীরটাকে ভালো করে পাকড়ে ধরে ডানহাত দিয়ে ওর ঘাড়টা মুচড়ে দিলুম ওকে একটা আওয়াজ করবার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়েই। আমার মোচড়ের সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ের কাছের ছোটো ছোটো কচি কচি হাড়গুলো ভেঙে যাবার শব্দ শুনতে পাই—মুট মুট মুড় মুড় মুড়; আর সেই সাথে খানিকটা রক্ত ছিটকে এসে লাগে আমার মুখে, ঠোঁটে, নাকের ডগায়। ঘাড়ের কাছের হলদে লোমগুলো লাল হয়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যেই। মুণ্ডটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেবার পরও ওকে আমি জড়িয়ে ধরে বসে থাকি। কেননা তখনও ওর শরীরটা আমার আলিঙ্গনের মধ্যে থেকে ছটফট করে উঠছিল, ওর দেহে তাপ ছিল তখনও। রবীন শিউরে উঠে দুহাত দিয়ে ওর চোখ ঢাকল যেন সেই বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে না পেরেই বিশাল বনভূমি, আমি ও মৃতপ্রায় ভেড়ার বাচ্চাটিকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ বাদে ও চোখ থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে তাকালে আমিও সম্মুখে তাকাই। অদূরেই আমাদের ঘর দেখা যায়, সাতসকালের পাতলা রোদ্দুরে বরফের টুকরোগুলো শাণিত অস্ত্রের মতো ঝকঝক করতে থাকে। কোথাও একটু বাতাস নেই, নিথর গাছের পাতাগুলো সামান্য ফিসফাস করে কথা বলতেও বুঝি ভয় পায়। রবীন তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। আমি রবীনের দিকে তাকিয়ে বলি—'রবীন তুই সবই জানিস। তোকে আমি সমস্ত কথাই খুলে বলেছি। আমি ভয়ানক হিংস্র হয়ে গেছি, ভয়ানক নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছি। এতসব জেনেও তোর এ ধরনের ন্যাকামো করবার কোনো মানে হয় না।' রবীন তবুও কোনো কথা বলে না, আমার দিকে পিছন ফিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এবার আমি উঠে দাঁড়াই, ওর কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই, শক্ত গলায় বলি—'ভেড়ার বাচ্চাটাকে ধর।' রবীন আমার দিকে ঘুরে তাকায়, কোনো শব্দ করে না, ভেড়ার বাচ্চাটার ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নেয়, হেঁটে যেতে থাকে। ওর মুখখানাকে আমার পাথরে খোদাই করা বলে মনে হয়। রবীন এগিয়ে যেতে থাকে, আমি ওর পিছু পিছু যাই। ভেড়ার বাচ্চাটার গলা বেয়ে রক্ত ঝরে টপ টপ টপ টপ।...

ঘরটা আমি তৈরি করেছিলুম ছোটো ছোটো ইটের মতন বরফের চাঁই দিয়ে অনেকটা এস্কিমোদের ধরনের। একটিমাত্র ঢুকবার বা বেরোবার দরজা ছিল, কোনো জানালা ছিল না। ছাদটা মাটি থেকে উঁচু হয়ে উঠে গিয়েছিল অর্ধবৃত্তের মতো। ঘরটা ছিল ভীষণ অন্ধকার আর ভীষণ ঠাণ্ডা। এ তল্লাটের আশেপাশে কোনো লোকবসতি না থাকায় ঘর তৈরি করবার জন্য এই জায়গাটা আমার খুব পছন্দসই হয়েছিল। আমার ঘরের সামনে ছিল এক গহন বন, সেই বন পেরোলে ধু ধু বালির মাঠ তারপর বুঝি লোকালয়। ঘরের পিছনে ছিল এক নদী। সে নদীর কোথায় যে শুরু আর কোথায় যে শেষ তা আমার জানা ছিল না, জানতে চেষ্টাও করিনি কোনো দিন। আমার ঘরের নিকটে এক পাতাবিহীন গাছ তার শুকনো ডালপাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত আর প্রায়ই একটা নাম না জানা বিকট চেহারাওলা কিন্তু দুঃখী দুঃখী পাখি উড়ে এসে বসত সেখানে। বড় বড় ভাঁটার মতো চোখ নিয়ে গোল গোল করে ঘুরেফিরে তাকাত চারদিকে আর কাঁদত মাঝেমাঝে মানুষের মতন। কী করুণ সেই কান্না, কী বেদনাদায়ক সেই সুর! ইনিয়ে বিনিয়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ভেউ ভেউ করে, ডাক পেড়ে, গলা ফাটিয়ে মড়াকান্না কাঁদত যেন সেই পাখি। আমি অবশ্য প্রথমে ওকে বিশেষ ভয় পাইনি। কিন্তু একদিন থমথমে অন্ধকার রাত্রে পাইখানা করবার জন্য বাইরে বের হলে হঠাৎ সেই পাখি বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'এখন জরুরি অবস্থা, এখন জরুরি অবস্থা।' আমি সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়ে একলাফে ঘরের ভিতরে এসে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলুম। ভয়ে আমার সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছিল; হাত, পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল আর ভয়ানক কাঁপছিলুম, হাড়ে হাড়ে লেগে শব্দ হচ্ছিল ঠকাঠক ঠক ঠক। কদিন পরে দেখলুম সেই পাখি আর আসে না কোথায় যেন উড়ে চলে গেল সেই পাখি, গাছে এসে আর বসল না উড়ে গেল নিরুদ্দেশে। আহা, আমার সেদিন মহা আনন্দ হয়েছিল। হাত, পা তুলে ডিগবাজি খেয়েছিলুম দশটা বিশটা।...

কবে যেন সন্ধেবেলা নদীর পাড় দিয়ে একা একা ঘুরছিলুম। বাতাস বইছিল জোরে, আকাশ ছিল পরিষ্কার, নদীতে ছোটো ছোটো ঢেউ ওঠানামা করছিল, দু-একটা তারা ফুটেছিল আকাশে। নির্জন নদীর ধার দিয়ে একা ঘুরছিলুম। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার বরফের ঘরটাকে একটা সাদা তাঁবুর মতন মনে হচ্ছিল। সমস্ত দিকের জানালাগুলো যেন খুলে যাচ্ছিল একটি একটি করে, যেন এক গভীর নিমগ্নতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলুম আমি; সময় গিয়েছিল স্তব্ধ হয়ে। একা একা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ আমি রবীনকে দেখতে পেলুম। প্রথমে আবছা আলোয় আমি ঠিক বুঝতে না পারলেও কাছাকাছি আসতেই তাকে চিনতে পারি। সমস্ত জামাকাপড় ভিজে, সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে, শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি—'এ কী দশা হয়েছে তোর?' ও কোনো কথা বলে না, হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিতে থাকে। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর

হাত ধরে ঝাঁকুনি দি, মুখের দিকে তাকিয়ে বলি—'বল কী হয়েছে তোর?' ও মাটিতে চোখ নামিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে—'ওরা আমায় মেরে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিল, বোধহয় ভাসতে ভাসতে চলে এসেছি। এবার ফিরে যাব।' এক নিমেষে আমার চোখের সামনে সেসব কিছুই যেন ওলটপালট হয়ে যায় তাই নদী, মাঠ, বন, ঘর, বাড়ি সবকিছুই গড়াতে গড়াতে দ্রুত দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। বিরাট অন্ধকার এক গহ্বরের দিকে পায়ের নিচের মাটিটা যেন তলিয়ে যেতে চায় আমায় নিয়ে। একমাত্র রবীন ছাড়া আমার নিকটে আর কেউ নেই এটা বুঝতে পেরেই দুহাতে প্রচণ্ডভাবে ওকে বুকে জাপটে ধরি, কাতরস্বরে ওর কাঁধে মাথা গুঁজে বলতে থাকি, 'তোকে আমি যেতে দেবো না। তুই আমার কাছেই থাকবি, আমার কাছেই থাকবি।...'

প্রবল উৎসাহে রবীনকে আমি আমার ঘর দেখাই। মস্ত বড় একটা মোমবাতি কাঠের টুলের ওপরে জ্বলছিল। বরফের দেয়াল বলেই বোধহয় ঘরের দেয়ালে আদৌ আমাদের দুজনের কোনো ছায়াই পড়ে না। মোমবাতির নিষ্কম্প শিখায় ঘরের সবকিছুই অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন চারদিকে তাকায়, আনন্দে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়। বলে—'করেছিস কী, এ যে এক এলাহি ব্যাপার?' আমি সলজ্জ হাসি হেসে বলি—'হ্যাঁ এই আমার ঘর বা রন্ধনশালাও বলতে পারিস।' রবীন তাকের কৌটোগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে, জিজ্ঞেস করে—'এগুলো কেন?' 'ওগুলো মশলাপাতি রাখবার জন্য জোগাড় করে রেখেছি। ওই যে কাচের বয়মটা দেখছিস, ওটাতে ভালো গাওয়া ঘি রাখব। আর এই দ্যাখ', ...আমি চৌকির তলা থেকে চকচকে ধারাল বঁটিটা বার করে দেখাই। রবীন হাত দিয়ে বঁটির ফলার ধার পরীক্ষা করে, ঘরের কোনায় তাকায়, তারপরই বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে—'শিলনোড়াও এনে রেখেছিস?' 'হ্যাঁ ভাই', আমি বলি—'মশলাবাটার অবশ্য হাঙ্গামা অনেক কিন্তু গুঁড়ো মশলায় রান্নার কোনো স্বাদই খোলে না। আসলে মশলাবাটার ওপরেই রান্নার স্বাদ নির্ভর করে, মানে মশলাটা তুই যত মিহি করে বাটতে পারবি তত তোর রান্না খোলতাই হবে।' রবীন ঘুরে ঘুরে আমার হাঁড়ি, কড়াই, থালা, বাটি, হাতা, খুন্তিগুলো উলটে পালটে দেখাতে থাকে। এখনও নতুন রয়েছে। ঝকমক করছে সবকিছু। রবীন আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়, বোধহয় আমি ওর মনের ভাব বুঝতে পেরেই বলে উঠি— 'রান্না একদিনও করিনি, করব। আপাতত ওই দেয়ালের শ্যাওলা খেয়েই কাটিয়ে দিচ্ছি।' রবীনকে আমি বরফের দেয়ালের গায়ে গজিয়ে ওঠা সবুজ শ্যাওলাগুলো দেখাই। 'তবে তুই যখন এসে গেছিস তখন এবার আমি রাঁধব, ভালো করেই রাঁধব। তা ছাড়া আমি এ সম্পর্কে ভেবেছি অনেক, লিখেও ফেলেছি অনেকটা। আসলে রান্নাটা হলো গিয়ে একটা উঁচুদরের আর্ট, হেলাফেলার জিনিস নয়। এই যেমন, ধর তুই সরষেবাটা দিয়ে ইলিশমাছ রাঁধছিস কিন্তু জানিস কি মাথাপিছু একটা

করে করমচা কেটে ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিলে অপরূপ স্বাদ হয়? জানে না, অনেকেই জানে না। আমি এইসব লিখে রেখেছি, এই সমস্ত রান্নার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অনেকটা লিখে ফেলেছি। এই দ্যাখ...।' ওকে আমি সুটকেস খুলে আমার বাঁধানো খাতাখানা বার করে দেখাই। খাতাখানা খুলে রবীন পাতা উলটে দেখে, কিছু কিছু অংশ পড়তেও থাকে। আমি ওকে বলি—'এ সমস্ত জিনিস অতিশয় প্রয়োজনীয় কেননা এগুলো ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে। এখুনি ধরে রাখা দরকার, ধরে রাখা দরকার।' রবীন হয়তো আমার কথা শুনতে পায় না, নিবিষ্টমনে আমার খাতাখানা পড়তে থাকে। খানিকবাদে ও মুখ তুলে আমার দিকে তাকায়, খাতাখানা বন্ধ করে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে ওঠে—'তুই কবে রান্না করবি বল? আমি আর লোভ সামলাতে পারছি না।' রবীনের এই প্রশংসাবাণীতে গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে ঠিক চার ইঞ্চি।...

আমরা দুজনে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলুম। আকাশে তখন আধখানা চাঁদ দেখা যায়। আবছা আলোয় আশেপাশের সবকিছুই মৃদু মৃদু বোঝা যায় বলে আমাদের কোনো কিছু চিনতে অসুবিধেই হয় না। সামনে গহন বন বিরাট এক অন্ধকারকে বুকে নিয়ে বিশাল এক দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে থাকে। রবীন বলে—'তুই সময় কাটাস কীভাবে?' 'কেন?'—আমি অবাক হয়ে বলি—'সময় কাটাতে আর অসুবিধে কী? ঘুমোই বেশিরভাগ সময় আর রান্নাবান্না সম্পর্কে ভাবি, মাঝেমাঝে বাসনপত্রগুলো নদীর জলে ধুয়ে মেজে পরিষ্কার করে রাখি। আর...আর...।' হঠাৎ আমার মনে হয় আসলে আরও অনেক কিছু আমার করা উচিত ছিল, অথচ এ ছাড়া আমি তো আর কিছুই করিনি সুতরাং রবীনকে আমি আর কী বলব ভেবে পাইনে। এমন সময় আমার সেই আধ-ছেঁড়া লুডোবোর্ডটার কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আমি বলি 'আর-আর—আমি মাঝেমাঝে লুডোও খেলে থাকি।' 'লুডো কি একজনে খেলা যায়?' রবীন প্রশ্ন করে। 'কেন যাবে না'—আমি রবীনকে বোঝাই—'একাই আমি দুজনের চাল দিই, মাঝেমাঝে চারজনেরও। খুব ইনটারেস্টিং খেলা। এবার তুই আর আমি দুজনে মিলে খেলব।' রবীন আমার কথার কোনো সাড়া দেয় না। অন্ধকার বনের দিকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে। একসময় বলে—'আচ্ছা, বনের ওপারে কী আছে রে?' 'বালির মাঠ'—আমি সংক্ষিপ্ত উত্তর দি। 'ওখানে যাসনি কোনো দিন?' 'না।' রবীনকে আর কথা বাড়াতে দিই না আমি। বনের ব্যাপারটা আমি ওর কাছ থেকে গোপন করতেই চাইছিলুম। রবীন এবার ঘরের পিছন দিকটায় এগোয়, আমিও ওর পাশে পাশে হেঁটে যেতে থাকি। তখন নদীর পাড় অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, জলতল থেকে এক অজানিত রহস্যময়তা সমস্ত কিছুকেই যেন অতি অদ্ভুতভাবে সাজাইয়া তোলে। রবীন বলে—'তোর নৌকো নেই?' 'না, নৌকো থাকবে কী করে?' 'কেন' রবীন সহজ সুরে বলে—'গাছের ডাল কেটে অনায়াসে নৌকো তৈরি করা যায়।' আমি চুপ করে যাই। নদীতে ছোটো ছোটো ঢেউ ভাঙার শব্দ হয়

ছলাৎচ্ছল আর  সেই শব্দ দিয়ে ধ্বনি দিয়ে অলক্ষে যেন কতশত মালা গাঁথা হয়। কী করে এই বিষয়টাও এড়িয়ে যাব বুঝতে পারিনে। তারপর কখন যেন বলি—'না বাবা, নৌকো ফৌকোতে আমার দরকার নেই। আমার বড় ভয় করে। আমি সাঁতার জানিনে।'...

কিছুদিনের মধ্যে রবীন গাছের ডাল ভেঙে একটা কাঠের নৌকো বানিয়ে ফেলল। সেটাতে চড়ে রবীন প্রায়ই দিনের বেলা ভ্রমণ করতে বেরুত—জলভ্রমণ। এই ভ্রমণের ফলে রবীনের অগাধ খিদে হতে লাগল। সবুজ শ্যাওলায় রবীনের খিদে মিটত না কিছুই। তখন ও আমায় বারবার বলতে শুরু করল—'এবার তুই রান্না কর, এবার তুই রান্না কর।' অথচ রান্না করবার মতন কোনো জিনিসই তখন আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না। ভোজ্যবস্তুর ভীষণ অভাব দেখা দিয়েছিল তখন।...

ভেড়াটার ছাল, চামড়া, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি সব ফেলে দিয়ে পরিষ্কার জল দিয়ে ওর চর্বিঅলা লালচে শরীরটাকে ভালো করে ধুয়ে ফেললুম। এবার ওটাকে একটা থালায় সাজিয়ে রাখি। ইতোমধ্যে রবীন অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক হতে পেরেছে। থালার কাছে উবু হয়ে বসে লোলুপদৃষ্টিতে ও ভেড়ার কাঁচা শরীরটা দেখতে থাকে। হাসতে হাসতে আমায় বলে—'কাঁচাই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।' আমি কিছু বলার আগে রবীন নিজেই বাসনগুলো নিয়ে নদীতে ধুতে যায়, বলে—'কাজটাজ করলে খিদেটা আরো বাড়বে।' এতদিন বাদে রান্নার সংবাদে ওর যেন আর আনন্দের অবধি থাকে না। রবীন চলে গেলে হঠাৎ আমার খেয়াল হয় যে, ঘি তেল মশলাপাতি কিছুই আমার নেই। সবই এখন জোগাড় করতে হবে। কিন্তু কী করে করব? ভাবতে ভাবতে আমি প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। আরও কি অপেক্ষা করতে হবে অনেক দিন? সবকিছুই কি ব্যর্থ হবে শেষে! দেহের ভিতরে খিদেটা যেন চাগিয়ে ওঠে, খিদের চোটে মাথাটাথা ঝিমঝিম করতে থাকে আমার। কোনো কূলকিনারাই খুঁজে পাইনে আমি। রবীন ফিরে এসে আমার অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করে—'হলো কী তোর?' আমি সমস্ত কিছু খুলে বলি ওকে। ও বিন্দুমাত্র ঘাবড়ায় না। বলে—'চল, ব্যবস্থা একটা হবেই, নৌকোটা কি এমনি এমনি তৈরি করেছি?' রবীন নদীতে নৌকোটা নামায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে নৌকোয় চড়তে হয়। নৌকো ভাসতে শুরু করে। কোথায় যে এই যাত্রার শেষ হবে আমাদের দুজনের একজনও হয়তো তা জানত না। তবুও আমরা নৌকো বেয়ে যাই।...

নৌকো থেকে লাফিয়ে পাড়ে নামতেই দেখি সকলে সারবন্দি হয়ে আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। যেন ওরা জানত আমরা এই সময়েই এসে পৌঁছব। আমাদের দেখে ওরা চেঁচিয়ে ওঠে—'এসেছে, এসেছে, অ্যাদ্দিনে এসেছে।' একগাদা জোয়ান ছোকরার দল হাত গুটিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে আসে—'এইবার, বাছাধনরা যাবে কোথায়?' ভয়ে আমার বুক ধুকপুক করতে থাকে তবুও

মুখে যথাসম্ভব হাসি টেনে পালাবার পথ খুঁজি। কিন্তু তখন সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোনো উপায় নেই। রবীনের ওপরেই ওদের আক্রোশটা যেন বেশি। দু-একটা বাচ্চাছেলে নদীর পাড় থেকে কাদা ছুড়তে শুরু করে রবীনের গায়ে। ইতোমধ্যে ভিড় ঠেলে ওদের সকলের উত্তেজনাকে ঠাণ্ডা করে এক বৃদ্ধ এগিয়ে আসেন। শান্তভাবে বলেন—'কী চাই?' আমি বিনীতভাবে আমাদের দরকারের কথা বলি। ভদ্রলোক শোনেন আর মুচকি মুচকি হাসেন—'সবই পাবে, সবই পাবে কিন্তু তার আগে...।' ওর কথা শেষ হবার আগেই ছোকরার দল আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে—'ধোলাই হবে, আড়ং ধোলাই।' 'না-আ-আ-আ'—ভদ্রলোক মাথার ওপরে দুহাত তুলে জোরগলায় বলে ওঠেন—'পুলিসি মার দেয়া হবে বন্ধুগণ, রক্তপাত হবে না একফোঁটাও। বাঁধুন, ভালো করে ওদের বাঁধুন।' বৃদ্ধের আদেশ পালন করতে ওরা আর বিন্দুমাত্র দেরি করে না। চটপট শক্ত দড়ি দিয়ে আমাদের দুজনের হাত পা মুড়ে বেঁধে ফ্যালে। তারপর শুরু হয় খেলা। আমাদের দুজনকে যেন ফুটবল বানিয়ে ওরা খেলতে থাকে। লাথি খেয়ে ওদিক যাই আবার লাথি খেয়ে এদিকে আসি। ওদিকে যাই, এদিকে আসি। এদিকে আসি, ওদিকে যাই। কে যেন একজন গলায় হারমনিয়া ঝুলিয়ে বাজাতে থাকে। একটা রিডই বোধহয় টিপে থাকে তাই একটানা একঘেয়ে আওয়াজ হয়ে চলে পোঁ-ও-ও-ও-ও-ও।...

খুব করে স্নান করে অনেকটা বিশ্রাম নেবার পরও আমাদের গায়ের ব্যথা যায় না। হাত পা সব টন টন করতে থাকে। তবুও উঠি, মশলা বাটি। রবীন স্তূপীকৃত শুকনো গাছের ডালপালায় আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন জ্বলতে থাকে দাউ দাউ করে। আমি ভেড়ার গায়ে মশলা মাখাই, পেটের ভিতরে মশলা পুরে সেলাই করে দিই। অনেকটা মশলা উদ্বৃত্ত থেকে যায়। শরীরে ব্যথা থাকা সত্ত্বেও উৎসাহে আমরা দুজনে টগবগ করে ফুটতে থাকি। একটা ডালের সঙ্গে ভেড়াটার হাত, পা বাঁধি, দুজনে ডালটার দুদিক ধরে উলটে পালটে ভেড়াটাকে আগুনে পোড়াতে থাকি। একটু বাদে মশলা পুড়ে সুন্দর গন্ধ বের হয়। আমাদের জিভ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। খিদের চোটে পাকস্থলিটা যেন মুচড়ে মুচড়ে ওঠে। বুঝি-বা ওটা নিজেই হজম হয়ে যেতে চায়। ভেড়াটার গায়ে অল্প অল্প বাদামি রং ধরে।...

হঠাৎ দেখি আমাদের ঘর গলে যাচ্ছে। সূর্যের প্রখর তাপে যে ঘর গলেনি সেই ঘর, আমাদের সেই সাধের ঘর এই আগুনের হলকায় গলতে থাকে। বরফের টুকরোগুলো ধীরে ধীরে গলে যায় আর কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো ঘরটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল দেখেও আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হই না। রবীনকে চিমটি কাটি, ও আমার দিকে তাকায়। আমি ওকে বলি—'বুঝতে পারছিস, এসব ওদের শয়তানি। এসব হচ্ছে আমাদের রান্নাটাকে পণ্ড করবার চেষ্টা।' ফাঁকা জায়গায় বাতাস পেয়ে আগুনের শিখাগুলি অসংলগ্নভাবে জ্বলতে থাকে, ছুটোছুটি করে

বেড়ায় তবুও নিবিষ্টমনে আমরা আমাদের কাজ করে যাই। ভেড়াটাকে রোস্ট করতে আমাদের বেশ অসুবিধা হয়, তবুও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকি। রান্নার গন্ধ পেয়ে বন থেকে পাখির দল ছুটে আসে, মাথার উপরে আকাশে দলবদ্ধ হয়ে উড়ে বেড়ায়। আমাদের দেখে সাহস পায় না নামতে। ঠিক সেই সময়েই অকস্মাৎ সেই নাম না জানা বিকট চেহারাওয়ালা কিন্তু দুঃখী দুঃখী পাখিটার ডাক শুনতে পাই। একটা বাচ্চাশিশুর মতো ওঁয়া ওঁয়া বলে কাঁদছে সেই পাখি, যেন সদ্য কোনো শিশুর জন্ম হয়েছে যার বাবা নেই মা নেই তাই একফোঁটা দুধের জন্য আকুল হয়ে হাত পা ছুড়ে কেঁদে যায়। ভালো করে চোখ ফোটেনি, ডাক ফোটেনি যার গলায়, সেই অসহায় শিশুটির বুকফাটা কান্নাকেই নকল করে পাখিটা আমাদের শোনাতে থাকে। আমাদের ভীষণ অস্বস্তি শুরু হয়, দুজনেই গম্ভীর হয়ে পড়ি। কান্নার আওয়াজ আরও বাড়তে থাকে। পাখিটাকে আমরা দেখতে পাইনে। হয়তো আগুনের ভয়ে বা অন্য কোনো কারণে লুকিয়ে ছিল বনের ভিতর, আমরা শুধু সেই অভিভূত করা কান্নাটাই শুনতে থাকি। আমি রবীনকে চিমটি কাটি। রবীন আমার দিকে তাকায়। আমি বলি—'বুঝতে পারছিস, এসব ওদের শয়তানি। আমাদের রান্নাটাকে পণ্ড করবার চেষ্টা করছে।' রবীন কোনো কথা বলে না। কী যেন ভেবে যায় আপন মনে। আমাদের রোস্ট করা শেষ হয়। রোস্টটাকে আমি একটা থালায় সাজাই, থালায় সাজিয়ে রাখবার সময় যেটুকু তেল মশলা আমার আঙুলে লেগেছিল তাই-ই আমি সন্তর্পণে জিভ দিয়ে চাটতে থাকি। পাখিটার কান্নার সুর আমাদের ভয়ানক বিমনা করে দেয়। রবীন চুপ করে কী যেন ভাবে। রান্না শেষ হলেও আমরা খেতে বসি না।...এক সময় রবীন হঠাৎ বলে ওঠে—'খাবারটা থাক।' আমি সমস্তই বুঝতে পারি। এই ভয়ই আমি করছিলুম কিংবা এই কথাটাই হয়তো আমি রবীনের মুখ থেকে শুনতে চাইছিলুম। তবুও প্রশ্ন করি—'কেন?' 'খেতে ইচ্ছে করছে না আমার', রবীন অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়; একটু থেমে বলে—'আমরা তো তবু শ্যাওলা খেয়ে কাটাতে পেরেছি, কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়ে নাতিনাতনির জন্য তো সেটুকুও রইল না।' গলে যাওয়া ঘরটার দিকে রবীন ছলোছলো চোখে তাকিয়ে থাকে। আমি প্রতিবাদ করবার কোনো সাহস পাই না। একটা অজানা আতঙ্কে শরীর-মন ছেয়ে যায়। তবুও ক্ষীণ কণ্ঠে বলি—'ওটা তো মিথ্যে কান্না।' 'হয়তো মিথ্যে, তবুও...।'—রবীন ঘন ঘন মাথা নাড়াতে থাকে। পাখিটার কান্না তখনও বড় করুণ হয়ে বাজে, আকাশ-বাতাসজুড়ে সেই কান্না গলে গলে পড়ে। আমি সম্মুখে সেই বিশাল বনভূমির প্রতি দৃষ্টিকে প্রসারিত করে রাখি। চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে, বুকের ভিতর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। অনেকক্ষণ বাদে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলি—'ঠিক আছে, তাই হোক।' পাখিটার কান্না ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। চতুর্দিকে এক শান্ত নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। শুধু আকাশে দু-একটা পাখি তখনও ওড়াউড়ি করে বেড়ায়। আমি একটা বড় থালা দিয়ে খাবারটা

ঢাকা দিয়ে রাখি। ভীষণ ক্লান্ত বলে মনে হয় নিজেকে, মনে হয় একলাফে বয়স বেড়ে গিয়েছে অনেকটা। খিদের কোনো তাগিদ বোধ করি না। শুধু একটু শুতে পারলেই যেন বেঁচে যাই। কোনো কিছু করবারই ক্ষমতা নেই তখন। রবীন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, কী যেন ভাবে আপনমনে, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বকে। আমার ভয় হয় ওকে দেখে, ওকে যেন একটা পাগলের মতোই দেখায়। একবার গিয়ে খাবারের ঢাকনাতে হাত দেয়, কিন্তু খোলে না। কেননা তখুনি আবার শুরু হয় পাখিটার করুণ কান্না। রবীন ছটফট করতে থাকে। কী করবে কিছুই যেন ভেবে পায় না। আমি এবার নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করি, আমার চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে, মাটি ভিজে যায়। এ কষ্টের ভার আমি আর যেন বইতে পারিনে। তারপর একসময় রবীন ছুটে যায় আঁস্তাকুড়ের দিকে যেখানে আমি ভেড়ার নাড়িভুঁড়িগুলো ফেলে দিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে ও গোগ্রাসে সমস্ত গিলতে থাকে। আমিও আর সামলাতে পারি না নিজেকে, শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বসে পড়ি ওর পাশে। দুজনে মিলে খেতে থাকি ভেড়ার শিং, মাথা, নাড়িভুঁড়ি, চামড়া এইসব। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়। দুজনে মুখ মুছে তারপর সেই ঢাকা দেয়া খাবারের থালাটার কাছে উবু হয়ে বসি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মতন। রোস্টের গন্ধ চারদিক আমোদিত করে তোলে, সেই গন্ধের ঝাপটা এসে লাগে আমাদের নাকে। আর আমরা সেই গন্ধ নাকে নিতে নিতে কত দিনের যেন কত রাতের যেন কত বছরের বুঝি হাজার হাজার বছরের খিদেয় শান দিতে থাকি।...